IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ষাটের দশকের ধারাবাহিক উপন্যাস ‘নগরপারে রূপনগর’: চার প্রজন্মের ইতিবৃত্ত : ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পায়েল হালদার, পি এইচ.ডি. গবেষক,
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ (Abstract): আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘নগরপারে রূপনগর’ উপন্যাসটি ষাটের দশকের শেষ থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক অমৃতলোক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ‘আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলীর দশম খণ্ডে’ উল্লেখিত ‘গ্রন্থ পরিচিতি’ অংশে বলা হয়েছে সাপ্তাহিক অমৃতলোকে সত্তরের দশকের দীর্ঘসময় ধরে এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল চৈত্র ১৩৭৩-এ, অর্থাৎ তখন ইংরেজি সাল দাঁড়াচ্ছে ১৯৬৭। অথচ সত্তরের দশকে অমৃতলোক পত্রিকায় এই উপন্যাস সম্পূর্ণ হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে। সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৬৭-তে এই উপন্যাসের পুস্তক আকারে প্রকাশের তথ্যটি অসংগতিপূর্ণ। আটচল্লিশ পরিচ্ছেদের দীর্ঘায়তন এই উপন্যাসটির তিনটি পর্ব আশুতোষ রচনাবলীর ১০ম, ১১ এবং ১২তম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনির শুরু হচ্ছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন থেকে এবং তা ত্বরান্বিত হচ্ছে পরবর্তী পনেরো বছর পর্যন্ত। একটি পরিবারের তিন প্রজন্মের ইতিবৃত্ত রয়েছে এই উপন্যাসে। চার প্রজন্ম ধরে দীর্ঘ সময়ের বিবর্তন এই উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। উপন্যাসটিতে এই দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনের ধারায় যে প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলি হল – দেশ বা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের বদলাতে থাকা রূপ, নগরায়ন এবং নাগরিক মনন, সামাজিক অবক্ষয়, মানসিক বিকার, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং মঙ্গলের পথে সেই চেতনাকে প্রবাহিত করার প্রয়াস। মূল গবেষণা পত্রে এই প্রসঙ্গগুলি নিয়েই তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ (Keywords): উপন্যাস, চরিত্র, সময়, প্রজন্ম, দাম্পত্য, শিশু, বিকার, প্রবৃত্তি, প্রেম, আধ্যাত্মবাদ, আশ্রম, মঙ্গলসাধনা।

মূল আলোচনা (Main Discursion): 'নগরপারে রূপনগর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিত্তশালী পরিবারের ঘরনী জ্যোতিরাণী। দেশ স্বাধীনতা পেলেও নারী জীবন যে তখনো কতটা পরাধীন এবং গ্লানিময় তা মানিকরাম চরিত্রের পরবর্তী তিন প্রজন্ম জুড়ে দেখা যায় এই উপন্যাসে। এর সঙ্গে দেখা যায় দেশীয় পরিস্থিতির বদলাতে থাকা রূপ। বিত্তশালী পরিবারে জন্মেও কলুষিত পরিবেশে শিশুমন কীভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পরে তাও দেখা যায় এই উপন্যাসে। কাহিনির আলোচনা পরিসরে উপন্যাসের এই বিষয়গুলিকে দেখানো সম্ভব।

কাহিনির দীর্ঘ ব্যপ্তিতে এই উপন্যাসে একটি অভিজাত চাটুজ্জে বংশের চার প্রজন্মের কথা জানা যাচ্ছে। এক. ১৯৪৭ সালের চল্লিশ বছর আগের মানিকরামের প্রজন্ম, দুই, মানিকরামের উত্তরপুরুষ সুরেশ্বরের প্রজন্ম, তিন, সুরেশ্বরের পুত্র শিবেশ্বরের প্রজন্ম এবং চার, শিবেশ্বরের পুত্র সাত্যকি বা সিতুর প্রজন্ম। এই চার প্রজন্মের মধ্যে সুরেশ্বরের প্রজন্মের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়নি উপন্যাসের। বাকি তিন প্রজন্মের কালকে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে তিনটি পর্যায়ে দেখা যাবে। এক, ভারতের স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকাল, দুই, স্বাধীনতার সমকাল এবং তিন, স্বাধীনতার উত্তরকাল। আর এই কালগুলির পরিবেশ ও পরিস্থিতি ধরেই নানা বিষয়ের কথা উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। মানিকরামের কালে দেখা গিয়েছে উনিশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র, যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সম্পত্তি ভোগের আশায় সতীদাহ প্রথার আড়ালে বিধবা নারীকে হত্যার পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের কথা এবং এর বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। উপন্যাসের চরিত্র মানিকরাম একই রকম যুক্তিবাদী মনের প্রকট প্রতিবাদ ও নারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। সমাজ ও নিজের পরিবার তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগী হয়ে মহানগরে গিয়ে প্রভুজীর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি। প্রভুজী তাঁকে সদা ন্যায়ের পথেই চালিত করেছে। এই প্রভুজী আসলে অন্যকোনো ব্যক্তি নয়, তার নিজস্ব মননেরই লুক্কায়িত রূপ। একদিকে তার যুক্তিবাদী আধ্যাত্মচিন্তায় লীন হয়ে থাকা ও অন্যদিকে ব্যবসা করে বিত্তশালী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত রয়েছে। আর যখন তিনি মহানগরের বুকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন, তখন যে পরিবার এককালে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মনভাবকে মেনে নিতে পারেনি, তারা এক এক করে গ্রাম থেকে শহরে এসে তাঁর কাছেই আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সংসারের এই ক্ষুদ্র স্বার্থের জগৎ যখনই তাকে বাঁধতে চেয়েছে তখনই তিনি গৃহত্যাগ করে প্রভুজীর ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মানিকরামের প্রজন্মের এই ইতিবৃত্ত থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে তিনটি বিষয় তা হল – এক. উনিশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, ও নারী নির্যাতন। অথচ নারীর পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে যুক্তিবাদী পুরুষকেই, নারীরাই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দঁড়াতে অক্ষম ছিল, ধর্মের নামে সতীত্বের নামে তাদের বোধশক্তিকে প্রায় গ্রাস করে রেখেছিল চটুল ব্রাহ্মণ সমাজ। রামমোহনের আদলেই খানিকটা মানিকরাম চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। সেই চরিত্রের মধ্যে দিয়েই প্রতিবাদ ও সেই সময়কার প্রকৃত অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের লড়াইকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। দুই, স্বার্থ এবং অর্থের হাতছানিতে ধর্ম অধর্ম সব ভুলে স্বার্থের পথেই হাঁটা মানুষে দেখা গেছে। এককালে যে পরিবার মানিকরামের সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৈশাচিক রীতির বিরুদ্ধে লড়ার বিরোধিতা করেছিল তারাই তাদের ধর্ম অধর্ম ভুলে মহানগরের বুকে প্রতিষ্ঠিত মানিকরামের বাড়িতে আপনার লোক হিসাবে বরাবরের জন্য আশ্রয় নিয়েছে। আর গ্রামে ফিরে

যায়নি। স্বার্থ দ্বারা বশীভূত মানুষের দ্বিচারী রূপকে কৌতুকময়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। তিন, অধ্যাত্ম চেতনার বিষয়, যে অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে রয়েছে 'আত্মানুসন্ধানের বৃহত্তর শুভবোধের আবেদন'।

প্রথম প্রজন্মের মানিকরামের পর যে প্রজন্মকে উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে দেখা যাচ্ছে সেটি হল মানিকরামের উত্তরপুরুষ সর্বেশ্বরের পুত্র শিবেশ্বরের প্রজন্ম। ঔপন্যাসিক যখন শিবেশ্বর চরিত্রটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন তখন সে পরিণত সংসারী পুরুষ। তার ঘরনী জ্যোতিরাণী। শিবেশ্বরের বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়ে পরিণত পর্যায় যখন উপস্থিত তখন সময়টা ছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার দিন থেকে শুরু হয়েছে এই উপন্যাস। সেইদিন শিবেশ্বরের স্ত্রী জ্যোতিরাণির দৃষ্টি দিয়েই স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ের দেশীয় পরিস্থিতির বিষয়গুলিকে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকেই পাঠক ফিরে দেখে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের ইতিহাস পেরিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল সেদিন সেই সংগ্রামের টুকরো টুকরো প্রতিচ্ছবি। সেই সময় নারীর অবলা নাম ঘুঁচতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। মাতৃভূমির মাহাত্ম্য বুঝেছে নারী, তারাঁও পিছিয়ে নেই। দিয়েছে আত্মাহুতি –'প্রীতি ওয়াদদেদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার –এঁরা তখন শক্তির খড়্গ হাতে নেমে পড়েছেন'[১]। উনিশ শতকের মানিকরামের প্রজন্মের ভারতের গ্রাম বাংলার যে নারীরা স্বামী সন্তান ও সতীত্ব রক্ষার চিন্তা নিয়েই কাটিয়ে ফেলত সারাটা জীবন তাদের অবস্থানের এই বিবর্তনের প্রসঙ্গটি লক্ষণীয়। অধ্যাপকের কন্যা জ্যোতিরাণীর ব্যক্তিত্বেও নারী চেতনার এই শক্তিরূপী বিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। সে অপেক্ষা করেছিল স্বাধীনতার, মনে মনে বাসনা রাখত স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি সক্রিয় কিছু ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হতে পারে। ছোটবেলায় জ্যোতিরাণীর একজন প্রেমিক ছিল, বাড়িওয়ালার ছেলে, নাম শুভ্রেন্দু, ডাকনাম শোভা। সেই নরম স্বভাবের ছেলেটি জ্যোতিরাণীকে খুশি করতেই তাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ভয়ঙ্কর খবর এনে দিত। কিন্তু জ্যোতিরাণী একদিন সেই ছেলের মানে আঘাত করায় সেও বীর বিক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পরে দিয়েছিল তাঁর প্রাণের আহুতি। দেশ প্রেম ও কল্যাণ সাধনার জন্য সেসময়কার নির্ভীক সরল চিত্তের তরুণদের হাসিমুখে এমন আত্মাহুতির বিষয়টি ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন খুব নির্লিপ্তভাবে। তবে এত সংগ্রামের পরেও যে স্বাধীনতা এসেছিল তা শুরুতেই শান্তির হয়নি। নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের বিশৃঙ্খল ভয়াবহ রূপটিও উঠে এসেছে উপন্যাসে। ১৫ই আগস্টের পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট ১৯৪৭ এ কলকাতার বুকে সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংস চিত্রকে তিনি দেখিয়েছেন –'জানালার একটা শার্সিও খুলতে পারেন না জ্যোতিরাণী। তাজা দেহ রক্তাক্ত হতে দেখেছেন, মাটিয়ে লুটোতে দেখেছেন। সেগুলো টেনে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছেন। প্রাণভিক্ষার আকুতি দেখেছেন। হত্যার উল্লাস দেখেছেন। ঘরের মধ্যে বসেও এক-একটা আর্তনাদ ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে বিঁধেছে, আর সেই সঙ্গে হত্যার মত্ত উল্লাসে কানের পরদা ফেটে যাচ্ছে'[২]। একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা আর একদিকে তখন দেশভাগের ফল স্বরূপ উদ্বাস্তু সমস্যা। ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় মানুষের প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসা, বাস্তু ত্যাগের কষ্ট, পিতা মাতা খুন হওয়ায় অনাথ শিশুর টিকে থাকার লড়াই, মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার, ধর্ষণ, জীবনের মূল স্রোত থেকে তাদের লাঞ্ছিত আত্মসম্মান নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গ্লানি সমস্তই আশুতোষ দেখিয়েছেন এই

উপন্যাসে, শিবেশ্বর ও জ্যোতিরাণীর প্রজন্ম যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তবে শুধু দেশীয় পরিস্থিতিই নয় শিবেশ্বরের প্রজন্মে আরো এক বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেই বিষয়টি হল একদিকে যেমন নারীর মানসিকতার বিবর্তনের বহমানতায় এই সময়কার নারীরা অনেকবেশি প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল তেমনই আবার সেই প্রগতিশীলতার মধ্যেও চারিত্রিক দ্বিচারিতাও ছিল প্রকটভাবে। এই দুই বিপরীত বিষয়ের মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছে জ্যোতিরাণী ও মিত্রাদি চরিত্র দুটি। এরা দুজনেই প্রগতিশীল চেতনার অধিকারিণী। দুজনেই শিক্ষার কদর বোঝেন, প্রগতিশীল সমাজ গড়বার তাগিদ অনুভব করেন, নারী স্বাধীনতার কথা ভাবেন। দেশের স্বাধীনতা হলেও যে নারীর স্বাধীনতা হয়েছে এবং নারী নিরাপদ –এমনটা নয় তা তারা দুজনেই উপলব্ধি করেন। উদ্বাস্তু ধর্ষিতা নারীদের আশ্রয়ের কথা ভেবে কিছু করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন। কিন্তু নিজ নিজ ব্যক্তিজীবনে দুজনের প্রগতিশীলরূপের প্রশ্ন উপস্থিত হলে বলতে হয় যে জ্যোতিরাণীর চরিত্রের সততা দৃঢ়তা মিত্রাদিকে ছাপিয়ে যায়। বাহ্যিকরূপে চটকদার মর্ডান সাজে পরিপাটি চেহারার মিত্রাদি মুখে প্রগতিশীলতার বুলি আওড়ালেও তিনি একজন দ্বিচারী মানুষ, স্বার্থান্বেষী। তাই বিবাহিত শিবেশ্বরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে তার দ্বিধা ছিল না। বন্ধু রূপে সংসারে প্রবেশ করে ভুজঙ্গের মতো বিষক্রিয়ায় মেতেছেন তিনি। আবার পুরুষের মধ্যেও দেখা গিয়েছে একইরকম প্রগতিশীল মনভাব এবং তারই বিপরীতে পুরষকারের অহংকার ও বিকার। এই বিষয় দুটির বিপরীত দিককে দেখা যাবে যদি শিবেশ্বর ও তার বন্ধু বিভাস দত্ত চরিত্র দুটিকে সামনাসামনি দাঁড় করানো যায়। লেখক বিভাস দত্ত সত্যই প্রগতিশীল চেতনা নিয়ে নারীর পাশে দাঁড়িয়েছেন বারবার। কখনো তিনি কন্যা স্নেহে আগলে নিয়েছেন উদ্বাস্তু অনাথ শিশু সমীকে আবার কখনো তিনি প্রকৃত বন্ধু ও প্রেমিকের মত পাশে থেকেছেন জ্যোতিরাণীর। এটা জেনেও তিনি আজীবন জ্যোতিরাণীর পাশে থেকেছেন যে জ্যোতিরাণীর ভালোবাসার পুরুষ তিনি নন। আর অন্যদিকে শিবেশ্বরের চরিত্রের প্রগতিশীলতা আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর পুরষকারের অহংবোধেই সে নিমজ্জিত, বিকারগ্রস্ত। তাই জ্যোতিরাণীর চরিত্রের দৃঢ়তাকে সে খর্ব করতে চায় এবং তা না পারায় প্রবৃত্তির আগুনে পুড়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। নানা পরিস্থিতিতে জ্যোতিরাণীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে চাওয়া, জব্দ করতে চাওয়া যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। মানসিক বিকার, প্রবৃত্তিগত অধঃপতন এবং এসবকে ছাড়িয়ে গিয়ে মঙ্গলের আলোকে এগিয়ে চলা – এই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করবো উপন্যাসের অন্তর্গত জ্যোতিরাণী, মিত্রাদি, শিবেশ্বর এবং বিভাস দত্ত -এই চারটি চরিত্রের মধ্যেকার সম্পর্কের তিনটি বৃত্তকে কেন্দ্র করে। সম্পর্কের বৃত্তগুলি এইরূপ –এক. শিবেশ্বর > জ্যোতিরাণী, **দুই**. শিবেশ্বর > মিত্রা, **তিন**. জ্যোতিরাণী > **বিভাস** দত্ত।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে শিবেশ্বরের সঙ্গে জ্যোতিরাণীর বিয়ে হয়। শিবেশ্বর অভিজাত পরিবারের মেধাবী ছেলে। নিজের মেধা দিয়ে সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ অর্থনীতিবিদ হিসাবে। কিন্ত এই মেধা ছাড়া চরিত্রের একাধিক ত্রুটির দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সংকীর্ণমনা, প্রভুত্ব ফলানোর জন্য বাসনাতুর, সন্দেহের বিষে বিষাক্ত তার মন, বিকারগ্রস্ত। সুন্দরী স্ত্রী জ্যোতিরাণীকে চিকিৎসার সময় ডাক্তার যখন তখন তাঁর চেহারা দেখে তার বয়সের অনুমান আরো কম করেছেন তখন ডাক্তারের প্রতি বক্র দৃষ্টি হেনেছেন শিবেশ্বর। দাঙ্গার দিনে সন্ত্রস্তা স্ত্রীকে অভয় দেওয়া দূরে থাক আবার একইরকম নিষ্ঠুর উক্তি করে অপমান করে বলেছেন -'তুমি

এত ভয় পাচ্ছ কেন? ওরা যদি দরজা ভেঙে ঢোকেই যদি, আমাকে কাটবে, ছেলের দিকে দেখলেন- ওই ওকে কাটবে, চাকর দুটোকে কাটবে। তোমাকে কি-চ্ছু বলবে না, তোমাকে খুব আদর করে নিয়ে যাবে ওরা'[৩]। আসলে জ্যোতিরাণীরকে তিনি বশ করতে পারেন না কোনোভাবেই। প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়েও শারীরিক নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা দেখিয়েও এই নারীকে তিনি মাত দিতে পারেন না। এমনকি প্রথম সন্তানের জন্মের পরেই অপারেশন করিয়ে তিনি জ্যোতিরাণীর গর্ভকে বেঁধে দিতে চেয়েছেন যাতে তাঁর মধ্যে খুঁত সৃষ্টি হয়। অন্য পুরুষ যেন জ্যোতিরাণীকে গ্রহণ করতে না পারে তেমন সন্দেহের নিরসনের মূলেই এই পৈশাচিক ব্যবস্থার কথা ভেবছেন সে। কিন্তু এই বিকারের জবাব জ্যোতিরাণী বরাবর দিয়েছেন নির্বিকার নির্লিপ্তভাবে। আর এখানেই বারবার তাঁর কাছে হেরে যেতে হয় শিবেশ্বরকে। মিত্রাদির সঙ্গে শিবেশ্বরের প্রবৃত্তিগত সম্পর্কও খানিকটা এই হেরে যাওয়ার জ্বালা থেকেই তৈরি হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কের কথা অকপটে উন্মোচিত হলে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন জ্যোতিরাণী শিবেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনেছেন। আধুনিক চেতনাসম্পন্না এই নারী সন্তানের জন্য ভেবেও প্রতারক নিষ্ঠুর স্বামীর ঘর ছাড়বেন না এমন সিদ্ধান্তে স্থির থাকেননি। বরং সন্তানকে যেন নিজের এই প্রতিবাদী সত্তার স্বরূপ দেখিয়ে নারীকে সম্মান করার শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন। এরপর তিনি বিভাস দত্তের আশ্রিতা সেই উদ্বাস্তু অনাথ শিশু কন্যা সমীকে পালন করেন। জীবনের প্রায় মধ্য পর্যায়ে এসে তিনি বিভাস দত্তকে বিয়ে করেছেন। তবে এই বিয়ের মূলে প্রেম ছিল না ছিল বন্ধুত্ব, পরস্পরের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার অঙ্গীকার। তৎকালীন সমাজের কদর্য বিদ্রুপকে নির্বিকার চিত্তে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজের শর্তে জীবনকে চালনা করেছেন জ্যোতিরাণী। ১৯৬৫ সালে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। উপন্যাসে চল্লিশের দশকের এমন একজন নারীর আধুনিক চেতনা, সাবলম্বিতা এবং আত্মমর্যাদার প্রকট রূপটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়। আরো যে বিষয়টি ঔপন্যাসিক শিবেশ্বরের প্রজন্মের শেষের দিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তা হল কর্মফল। অশুভ কর্মের ফলও যে অশুভ এবং মর্মান্তিক হয় তাও দেখিয়েছেন তিনি মিত্রাদির আকস্মিক মৃত্যু এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিবেশ্বরের গ্লানিময় জীবন নিয়ে একাকী বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে।

এই উপন্যাসের অন্তর্গত চাটুজ্জে পরিবারের শেষ প্রজন্ম হল শিবেশ্বরের পুত্র সাত্যকির প্রজন্ম। পিতা মাতার সম্পর্কের জটিলতা ও অসুস্থ দাম্পত্যের প্রভাব যে সন্তানের মানসিকতায় কতটা সাংঘাতিক প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়টিকে চিহ্নিত করা যায় শিবেশ্বর ও জ্যোতিরাণীর একমাত্র সন্তান সাত্যকি চরিত্রটি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই বাড়ির অন্যান্য অবিভাবকদের স্নেহ পেলেও বাবা মায়ের স্নহের আদ্রতা সাত্যকি উপলব্ধি করেনি। একপ্রকার ভালোবাসাবিহীন অনুশাসনের মধ্যে দিয়েই তার বেড়ে ওঠা। ফলে ছোটবেলা থেকেই শিশুমনে একধরনের ক্রুরতার সঞ্চার হয়। ছোটবেলায় প্রথম আলাপে যে ফুলের মতো নিষ্পাপ অনাথ অসহায় মেয়ে সমীকে সে ষড়যন্ত্র করে টুল থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়েছিল সেই সমীকেই যুবকাবস্থায় সে ভালোবেসেছিল। কিন্তু শিবেশ্বরের বিকারের বীজ যেন জিনগতভাবেই ঢুকে গিয়েছিল সাত্যকির শরীরে। তাই এক পর্যায়ে চারিত্রিক স্খলন ঘটেছিল তাঁর। সে সমীকে ধর্ষন করেছিল। কিন্তু বিভৎসতার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের ইতি টানা আশুতোষ মুখোপাধ্যের সাহিত্যের রীতি নয়। প্রবৃত্তির এই গ্লানি

থেকে সাত্যকি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। হরিদ্বারে আনন্দবাগে এসে আনন্দবাবার কাছ থেকে জীবনের মূল মন্ত্র পেয়েছে সে –'ধৈর্যশূন্য তেজ শুধু দগ্ধায়, নম্রতাশূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়, বিনয়শূন্য সামর্থ্যের নাম দাম্ভিকতা আর বুদ্ধিশূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার'[৪]। এই সত্যকে উপলব্ধি করেই আলোর পথে হাঁটা শুরু হয় সাত্যকির। আর চল্লিশ বছর আগে মানিকরামের প্রজন্মে প্রভুজি যেন ফিরে আসেন সাত্যকির চরিত্রে। উপন্যাসের শেষে প্রভুজির হাতছানিতেই যেন সাত্যকির গৃহত্যাগী হয়ে আরো বড় কোনো মঙ্গলসাধনের মার্গে চলে যাওয়া। আধ্যাত্মিকতার পথে আলোর খোঁজে তার প্রস্থান –'আমার না বেরিয়ে উপায় নেই জেঠু। রূপনগরের জন্য আরো সাদা নজির চাই, আরো জ্যোতি চাই, আলো চাই। ...তাদের বোল, সিতু আরো কিছু আলোর খোঁজে গেছে, আবার ফিরবে'[৫]। নগরের মানুষের ঝুটা আভিজাত্য, অহং বোধ, ভোগ সর্বস্বতা, ব্যভিচার এই সমস্ত বিষয় থেকে মুক্তির পথের সন্ধান করতে করতেই ঔপন্যাসিক আশুতোষের 'নগরপারে রূপনগরে'র নির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

১. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১০, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪, তৃতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, পৃ.২২২।
২. তদেব, পৃ. ২৬১।
৩. তদেব, পৃ. ২৬২।
৪. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১১, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৫, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, পৃ.৬ (ভূমিকা)।
৫. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১২, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৫, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, পৃ.৫১৯।

সহায়ক নিবন্ধ / প্রবন্ধ:

১. প্রণয়কুমার কুন্ডু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১২, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০৫, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩, পৃ.৫১৯।

২. বারিদবরণ ঘোষ, ভূমিকা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১১, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০৫, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩।

৩. সুমিতা চক্রবর্তী, 'রূপনগরের দীপ্তি: কথাশিল্পীর কলমে', আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১০, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৪, তৃতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭৩।

সহায়ক পত্রিকা

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ পৌষ ১৪২০, ১১ জানুয়ারি,২০১৮।
২। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'সবিনয় নিবেদন', কলকাতা-০১।